দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 5 OCT 2012
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

এমপিওভুক্তি নিয়ে জটিলতা কেন?

■ সাইদুর রহমান

নীতি জটিলতা ও সংকটের বেড়াজালে আটকে রয়েছে বেসরকারি শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি। তবে নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত না হওয়ার মূল কারণই আর্থিক সংকট। টাকার অভাবে এমপিও (মাস্থলি পেমেন্ট অর্ডার) বন্ধ রয়েছে। সর্বশেষ ২০১০ সালের পর আজ পর্যন্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি করা হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রথমে পাঠদানের অনুমতি নিতে হয়। তারপর একাডেমিক স্বীকৃতি এরপর শিক্ষার পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ২

এমপিওভুক্তি নিয়ে এতো

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কার্যক্রম শুরু, শিক্ষক পরীক্ষার ফলাফল, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের যোগ্যতা মূল্যায়নের পরই এমপিওভুক্তি করা হয়। সংসদ সদস্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তালিকা যাচাই-বাছাই করে বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, এমপিওভুক্তির তালিকা চূড়ান্ত করা হলেও শুধু অর্থের অভাবে কার্যকর হচ্ছে না। এমপিওভুক্তির যে নীতিমালা রয়েছে সে অনুযায়ী দেশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক রয়েছেন যারা এমপিওভুক্তির দাবিদার। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এমপিওভুক্তির কার্যকর না চালানোয় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক এমপিওভুক্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। পাশাপাশি প্রচুর নতুন শিক্ষক আছেন যারা শিগগিরই এমপিওভুক্ত হওয়ার কাতারে চলে আসছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এমপিওভুক্তির জন্য ৭ হাজার ৫৩৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবেদনের মাধ্যমে প্রাথমিক যাচাইয়ের পর ৭ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হয়। এর মধ্যে অধিকতর যোগ্য ১ হাজার ৬১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ ছাড় না দেয়ায় এমপিওভুক্ত করা যাচ্ছে না এমন দাবি স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রীর।

২০১০ সালের ৩০ মে এমপিওভুক্তি পর্যালোচনার পর বহুল আলোচিত ও প্রতীক্ষিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করে বর্তমান সরকার। ১৯৯৭ সালের নীতিমালার আলোকে ২০১০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি নতুন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির নীতিমালার আওতায় এই এমপিওভুক্তি দেয়া হয়। এমপিওভুক্ত হয় মোট ১ হাজার ৬১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এরপর থেকেই বন্ধ রয়েছে এমপিওভুক্তির কার্যক্রম। অথচ শিক্ষকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বারবার এমপিওভুক্তির আশ্বাস দেয়া হলেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। ফলে বাধ্য হয়ে শ্রেণীকক্ষ ছেড়ে আন্দোলনের মাঠে নেমেছেন বেসরকারি শিক্ষকরা। এর আগে ২০০৪ সাল থেকে বেসরকারি শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত বন্ধ ছিল।

এমপিওভুক্তির নীতিমালা

নীতিমালায় এমপিওভুক্তির জন্য মানদণ্ড ঠিক রাখতে ১০০ নম্বর বরাদ্দ রাখা হয়। এতে একাডেমিক স্বীকৃতির জন্য ২৫, শিক্ষার্থীর জন্য ২৫, পরীক্ষার্থীর সংখ্যার জন্য ২৫ এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হারের জন্য ২৫ নম্বর রাখা হয়। এতে স্বীকৃতির সময়সীমা ২ বছর হলে ৫ নম্বর পাওয়া যাবে। যদি স্বীকৃতির সময়সীমা ১০ বছর বা তারও বেশি সময় হয় তাহলে ২৫ নম্বর পাওয়া যাবে। শিক্ষার্থীর সংখ্যায় কাম্যসংখ্যার জন্য ১৫ নম্বর দেয়া হয়। তবে কোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা কাম্যসংখ্যার পরবর্তী প্রতি ১০ শতাংশের জন্য ৫ নম্বর প্রদান করা হয়। একইভাবে পরীক্ষার্থীর এবং ফলাফলের ক্ষেত্রে নম্বর প্রদান করা হয়।

এমপিওভুক্তির যাত্রা যেভাবে

শিক্ষা বিস্তারে প্রথম পদক্ষেপটি ছিল পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন। সেই সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে আইন প্রণয়ন করে। সে সময় অনেকগুলো নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্য পর্যায়ে শিক্ষা বিস্তারের বেসরকারি উদ্যোগটি সরকারের স্বীকৃতি পেয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী বঙ্গবন্ধু সরকার সারাদেশে সরকারি প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিল প্রায় ৪ হাজার। প্রতি স্কুলে ৪ জন করে সরকারি শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। এরপর ১৯৯৬ সালে সরকার বেসরকারি সব মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতনের প্রথমে শতকরা ৮০ ভাগ পরবর্তী সময় শতভাগ ব্যয়ভার গ্রহণ করল। এই পদক্ষেপটিই এমপিও (মাস্থলি পেমেন্ট অর্ডার) নামে অভিহিত হয়। ওই আমলে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫০০ এমপিওভুক্ত করেছিলেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী। বর্তমানে প্রায় ২৮ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত রয়েছে।

উল্লেখ্য, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির দাবিতে গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে আন্দোলন করে আসছে শিক্ষকরা। এর আগে শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনায় বসেও কোনো আশ্বাস মেলেনি। সর্বশেষ ২৩ সেপ্টেম্বর শিক্ষকরা শিক্ষা সচিবের সঙ্গে বসলে তিনিও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত জানাতে পারেননি। তাই শিক্ষকরা তাদের দাবি বাস্তবায়নে এবার প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির অপেক্ষায় রয়েছেন।